একটি মরণ-বাঁচনের গল্প

স্বামী চেতনানন্দ

অধ্যক্ষ, বেদান্ত সোসাইটি অফ সেন্ট লুইস, আমেরিকা

গল্প দিয়েই মানবজীবন শুরু হয়। শিশু যখন কথা বলতে শেখে তখন তার মনে জাগে অসংখ্য জীবনজিজ্ঞাসা। কে, কী, কেন, কখন, কোথায়, কাকে, কার, কীভাবে, কোনদিকে, কেমন ইত্যাদি শব্দ যোজনা করে প্রশ্ন তৈরি হয়। মা-বাবা ও আত্মীয়েরা শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেন। তারপর আসেন ঠাকুমা তাঁর গল্পের ঝুলি নিয়ে। গল্প শুনতে চাই কৌতূহলী মন, লাগামহীন কল্পনা ও বিশ্বাসপ্রবণতা। শিশুদের এই তিনটেই থাকে। তাই তারা আবদার করে ঠাকুমাকে বলে—একটা গল্প বলো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

''শুধু শিশু বয়সে নয়; সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে, যুগে যুগে, মুখে মুখে, লেখায় লেখায় গল্প যা জমে উঠেছে তা মানুষের সকল সঞ্চয়কেই ছাড়িয়ে গেছে।''

পত্রপত্রিকায় সাধারণত দেখা যায়—ছোট গল্প, বড় গল্প, প্রেমের গল্প, আজগুবি গল্প, ভূতপ্রেতের গল্প, গল্প হলেও সত্যি ইত্যাদি। কিন্তু এ-প্রবন্ধের গল্পটি ভয়ংকর। কারণ এটি মরণ-বাঁচনের সঙ্গে যুক্ত। মহাভারতের এই গল্পটির পরিবেশ বিশাল অরণ্য—মধ্যে একটি সরোবর। এর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে এক পায়ে খাড়া একটি অদ্ভুত বক। তার সামনে পড়ে আছেন ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—চার বীর পাণ্ডুপুত্র। বিনা যুদ্ধে তাঁরা ভূপতিত ও মৃত।

গল্পটির উৎস মহাভারতের বনপর্বের শেষে 'আরণেয়পর্বাধ্যায়'।

পঞ্চপাণ্ডবের বারো বছর বনবাসের শেষ হতে চলেছে। একদিন এক ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন, ''আমি যজ্ঞে আগুন জ্বালাবার অরণি (নিচের কাঠ) ও মন্থ (উপরের কাঠ) বৃক্ষে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। একটি হরিণ ওইগুলি শিঙে আটকে নিয়ে পালিয়েছে। আপনারা তা উদ্ধার করে আমার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ রক্ষা করুন।'' ব্রাহ্মণের ধর্মরক্ষা করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ভাই ধনুর্বাণ নিয়ে হরিণের পিছনে ছুটলেন, কিন্তু কোনও বাণ দিয়ে তাকে বিদ্ধ করতে পারলেন না। হঠাৎ হরিণ অন্তর্হিত হল। পাঁচ ভাই প্রচণ্ড ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। যুধিষ্ঠির নকুলকে বললেন, ''গাছে চড়ে দেখো তো কোথাও জল পাওয়া যায় কী না।'' নকুল গাছে উঠে দূরে একটা সরোবর দেখতে পেলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরের আদেশে তিনি জল আনতে গেলেন।

নকুল সরোবরে গিয়ে প্রথমে নিজে জল পান করতে গিয়ে শুনলেন বকরূপী এক যক্ষের বাণী—''এ সরোবর আমার। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জলপান করো নতুবা মরবে।'' পিপাসার্ত নকুল কথা অগ্রাহ্য করে যেই জল পান করলেন অমনি ভূপতিত হলেন। এভাবে ক্রমে সহদেব, ভীম, অর্জুন জল আনতে গিয়ে প্রাণ হারালেন। অবশেষে যুধিষ্ঠির গেলেন। যেই জলপান করতে যাবেন অমনি উপর থেকে শুনলেন—''আমি মৎস্য শৈবালভোজী বক। আমি তোমার ভাইদের পরলোকে পাঠিয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যদি জলপান করো, তবে তুমিও সেখানে যাবে।''

যুধিষ্ঠির বললেন, ''আপনি কোন দেবতা? আপনি আমার চার বীর ভাইকে নিপাত করেছেন। আপনার অভিপ্রায় বুঝতে পারছি না। আমার ভয়ও হচ্ছে, কৌতূহলও হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি প্রশ্ন করুন, আমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দেব।''

শুরু হল যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের পরস্পর প্রশ্নোত্তর। যক্ষের ছত্রিশটি শাস্ত্রীয়, ধর্মীয়, জাগতিক নানাবিধ কঠিন শাণিত প্রশ্নের যথাযথ নির্ভুল উত্তর দিলেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। যক্ষ এই ছত্রিশটি প্রশ্নের ভিতর জুড়ে দিয়েছেন শতাধিক প্রশ্ন। মহাভারতের এই অপূর্ব প্রশ্নোত্তরমালার মধ্যে পাই বহু জীবনজিজ্ঞাসার সদুত্তর। যুধিষ্ঠিরের সঠিক উত্তরের উপর নির্ভর করছিল চার ভাইয়ের জীবন। সুতরাং এগুলি মরণ-বাঁচনের প্রশ্নোত্তর। এ-প্রবন্ধে আমরা মানবজীবনের চারটি vital প্রশ্ন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

যক্ষ—কো মোদতে কিমাশ্চর্যং কঃ পন্থাঃ কা চ বার্তিকা—সুখী কে? আশ্চর্য কী? পথ কী? বার্তা কী? এই চার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জল খাও।

যুধিষ্ঠির—দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।/ অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥—হে জলচর বক, যে-লোক ঋণী ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অষ্টম ভাগে (সন্ধ্যাকালে) শাক রন্ধন করে সেই সুখী।

আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি ঋণগ্রস্ত ও গৃহহীন ব্যক্তির সুখ নেই। ঋণের বোঝা মাথায় থাকলে ঘুম হয় না। যথাকালে ঋণ শোধ না করতে পারলে ঋণদাতার কাছে অপদস্থ ও অপমানিত হতে হয়। কথায় বলে—দুর্দিনে বন্ধুর বাড়িতে অন্নগ্রহণ করো, কিন্তু তার বাড়িতে থেকো না। কারণ তুমি স্বাধীনতা হারাবে। পরাধীনের কখনও সুখ হয় না। নিজের বাড়িতে শাকান্ন আত্মীয়ের বাড়ির পলান্ন অপেক্ষা তৃপ্তিদায়ক।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদাকে উপদেশ দিয়েছিলেন : ''তুমি কামারপুকুরে থাকবে; শাক বুনবে—শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে।... একটি পয়সার জন্যে যদি কারও কাছে হাত পাত, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে।... বরং পরভাতা ভাল, পরঘোরো ভাল নয়। তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজের বাড়িতে আদর করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট করো না।'' এই সুখী হওয়ার উপদেশটি

মহাভারতের বাণীর সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—আশ্চর্য কী?

যুধিষ্ঠির—অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম-মন্দিরম্।/ শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্॥—প্রাণিগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হতে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য কী আছে?

এই অনিশ্চিত জগতে মৃত্যুটা একেবারে নিশ্চিত। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'—জন্মিলে মরিতে হবে। এটি ভগবদ্‌বাক্য। জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভই অমৃতত্ব। এটি প্রত্যেক মানুষ চাইছে। কেউ মরতে চায় না। একজন জনৈক সাধুকে জিজ্ঞাসা করল—''মির‍্যাকল কী?'' সাধুটি উত্তর দিল—''আমরা বেঁচে আছি এটাই মির‍্যাকল বা আশ্চর্য ব্যাপার। এখনি যদি কেউ তোমাকে জলের মধ্যে জোর করে পাঁচ মিনিট ডুবিয়ে রাখে, তুমি অবশ্যই মরবে।'' যাস্ক বলেন—আশ্চর্যম্ অনিত্যে—এই জগৎটা অনিত্য কিন্তু আমরা নিত্য মনে করি—এটিই আশ্চর্য। কথায় বলে—ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

তৃতীয় প্রশ্ন—পথ কী?

যুধিষ্ঠির—বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।/ ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥—বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, যাঁর মত ভিন্ন নয় তিনি মুনিই নন। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, অতএব মহাজন যে-পথে গেছেন সেই পথই পথ। কী অপূর্ব উত্তর! ধর্মের তত্ত্ব প্রতি মানবের হৃদয়গুহায় রয়েছে; অথচ আমরা সত্যের সন্ধানে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। ছান্দোগ্য উপনিষদ এই হৃদয়গুহাকে 'ব্রহ্মপুর' বলেছেন। গীতাতে কৃষ্ণ বলেছেন—ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি—ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে বাস করছেন। শাস্ত্র আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন—এ-পথ তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাঁটার মতো দুর্গম বটে, কিন্তু অসাধ্য নয়।

ভারত সংস্কৃতিতে দেবতা মানুষকে শুনিয়েছেন গতির মন্ত্র। গতিহীনতাই মৃত্যু আর গতিশীলতাই জীবন। জীবনে চলার পথে মানুষ যখন গতিহীন হয়ে পড়ে, দিশেহারা হয়ে যায়, লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে, তখন এই ঋগ্‌বেদের মন্ত্র 'চরৈবেতি'—এগিয়ে চলো—আমাদের জীবনকে উজ্জীবিত করে, অসাড় প্রাণে সাড়া জাগায়। পৃথিবীতে সব মানুষই পথিক। এ-জগৎ পান্থশালা। প্রত্যেকেই চলছে। চলার বিরাম নেই। তবে যারা মোহান্ধ, তারা অনেক সময় ভুল পথে চলে গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ে, আর পথ খুঁজে পায় না। তখন পথপ্রদর্শক গুরু এসে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান।

যিশু বলেছেন—I am the way—আমার জীবন ও বাণীই হল পথ। সব অবতার ও সাধুসন্তেরা 'মহাজন'। তাঁরা নিজেরা চলে অপরকে সেই পথে চলে লক্ষ্যে পৌঁছবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। গীতাতে আছে—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, অপর সাধারণেও তাই করে। তিনি যা প্রামাণ্য বা কর্তব্য বলে গ্রহণ করেন, সাধারণ লোকে তারই অনুবর্তন করে। (৩।২১)

মায়ার ভেল্কিতে আমরা চোখ থাকতে ঠিক পথ দেখি না। মায়ায় বদ্ধ হয়ে ছোটাছুটি করছি। একবার এক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে লেখেন, ''মা, আমি কি পথ হারালাম?'' মা উত্তরে লিখেছিলেন, ''পথ হারাবে কেন, পথ পাবার জন্যই তো এখানে আসা।'' কী সুন্দর উত্তর মানবজাতির প্রতি—আমিই পথ, আমিই লক্ষ্য—আমি জগদম্বা। এষাস্য পরমা গতিঃ।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর—অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।/ মাসর্তুদর্বী-পরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা॥—এই মহামোহরূপ কটাহে কাল প্রাণিসমূহকে পাক করছে; সূর্য তার অগ্নি, রাত্রিদিন তার ইন্ধন, মাস-ঋতু তার দর্বী (হাতা)—এই হল বার্তা।

আমরা পথে বা বাজারে পরিচিত লোকদের বা ফোনে বন্ধুকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করি—এই, খবর কী? এই খবর বা বার্তা জানবার জন্য সকালে আমরা খবরের কাগজ পড়ি; রেডিও ও টেলিভিশনে দেশ-বিদেশের বার্তা শুনি ও দেখি। কিন্তু যুধিষ্ঠির মহাকালের যে-ভয়ংকর বার্তা শোনালেন তাতে ভয় লাগে। দেখো হে—এই বিরাট কড়াইটা লোহার ঢালাই নয়; এটা মহামোহ দিয়ে তৈরি। মহাকাল এই কড়াইয়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণীকে টগবগ করে ফুটিয়ে রান্না করছেন। সূর্যের তাপ জ্বলন্ত অগ্নির মতো কড়াইয়ের নিচে দাউদাউ করে জ্বলছে। রাত ও দিন হল ইন্ধন বা কাঠ। মাস-ঋতু হল হাতা। মহাকাল সমস্ত প্রাণীকে এ-জগৎ থেকে তাদের কর্মানুযায়ী মুক্তি বা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

এ-বার্তা গীতায় আছে—কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো/ লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ—আমি লোকক্ষয়কারী অতিভীষণ কাল; এখন এই লোকেদের সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। চণ্ডীতেও আছে—কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা—দেবী ভগবতী কালরাত্রি (যাতে ব্রহ্মার লয় হয়), মহারাত্রি (যাতে জগতের লয় হয়), আর মোহরাত্রি (যাতে জীবের নিত্য লয় হয়)।

দিন-রাত্রি, মাস-ঋতু চক্রবৎ ঘুরছে। শংকরাচার্য গাইছেন—দিনমপিরজনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।/ কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥—দিনরজনী, সন্ধ্যা ও প্রাতঃ, শীত-বসন্ত পুনঃ পুনঃ আসে; কাল ক্রীড়া করে, আয়ু অতিবাহিত হয়—তথাপি বৃথা আশা কারওকে ত্যাগ করে না। সুতরাং ভজ গোবিন্দম্।

আমরা ঘটা করে জন্মদিন পালন করি। হাসিমুখে সবাইকে আদর-আপ্যায়ন করি, খানাপিনায় মত্ত হই। কিন্তু এই বার্তা কেউ দেয় না যে তোমার জীবনের একটা মূল্যবান বছর চলে গেল। তুমি জীবনে কী লাভ করলে? যুধিষ্ঠির আমাদের নশ্বর জীবনের পরিণতি স্মরণ করিয়ে বার্তা দিচ্ছেন—সর্বগ্রাসী নিষ্ঠুর কালের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করো। জেনো—কালের প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ নেই। কাল সবাইকে সমানভাবে আকর্ষণ করছে। মহাকালের দ্বারা বিশাল তপ্ত কড়াইতে রোগ-শোক, দুঃখ-যন্ত্রণা, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে সিদ্ধ না হয়ে ভগবানলাভ করে সিদ্ধ হও।

সন্তুষ্ট যক্ষ বললেন, ''তুমি এক ভ্রাতার নাম বলো যাকে বাঁচাতে চাও।'' যুধিষ্ঠির নকুলের জীবন প্রার্থনা করলেন। সবিস্ময়ে যক্ষ বললেন, ''তুমি ভীম-অর্জুনকে ছেড়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের জীবন চাইছ কেন?'' যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, ''যদি আমি ধর্ম নষ্ট করি তবে ধর্মই আমাকে বিনষ্ট করবেন। আমার পিতার দুই স্ত্রী—কুন্তী ও মাদ্রী। আমি চাই আমার দুই মায়ের দুই পুত্র বেঁচে থাকুক।''

যক্ষ খুশি হয়ে সব ভ্রাতার জীবনদান করলেন। কৌতূহলবশত যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—''আপনি কোন দেবতা? মনে হয় আপনি আমাদের সুহৃৎ বা পিতা।'' যক্ষ বললেন, ''বৎস, আমি তোমার পিতা ধর্ম। তুমি বর চাও।'' যুধিষ্ঠির বললেন, ''একটি হরিণ ব্রাহ্মণের অরণি ও মন্থ নিয়ে গেছে, তা পাইয়ে দিন যাতে তাঁর যজ্ঞ নষ্ট না হয়।'' যক্ষরূপী ধর্ম বললেন, ''তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য আমিই মৃগরূপে অরণি ও মন্থ হরণ করেছি। এখন তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি অন্য বর চাও।''

যুধিষ্ঠির বললেন, ''শর্ত অনুযায়ী আমরা বারো বছর বনবাস করেছি; এখন এক বছর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। আমাদের যেন কেউ চিনতে না পারে।''

ধর্ম আশ্বাস দিলেন—''তাই হবে। তোমরা নিশ্চিন্তে বিরাট রাজার নগরে অজ্ঞাতবাস করো।''

মহাভারতের এই অপূর্ব অমর কাহিনি এখানে শেষ হল।